বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

বাংলাদেশের লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষি : অতীত ও বর্তমান

মল্লিক আনোয়ার হোসেন*

Agriculture of Saline Zones in Bangladesh: Past and present

Mollick Anwar Hossain

Abstract : Agriculture is the main occupation of the saline zones of Bangladesh. Majority of the population in saline zones are still engaged in agriculture. Shrimp culture was introduced in late seventies in the saline zones and is gradually getting important for its increasing foreign exchange earning. Unplanned and unscientific shrimp cultivations have drastically reduced the stock of indigenous crop and fish varieties. The shrimp culture also affects green vegetation and ecosystem that causes destruction of natural resources. Horticultural crop like coconut, betelnut, banana, etc., which are indigenous to the saline areas, are totally damaged for increasing salinity. Saline water is essential for shrimp cultivation but it is harmful for crop cultivation. So, farmers who constitute the majority of the farming do not have access to crop cultivation due to the high level of salinity. Without crop productions, farmers in saline zones become poorer. As a result, they sell their lands to the owners of shrimp farms. So shrimp culture results in serious social and ecological problems in saline regions. In the following article the past and present agricultural system of saline zones in Bangladesh has been compared. At the same time, it will have some suggestions to overcome problems.

ভূমিকা

কৃষির সাথে এ দেশের মানুষের অনন্তকালের সম্পর্ক । স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে তবুও কৃষিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে জিডিপিতে কৃষির অবদান প্রায় ২৫ ভাগ (BBS, 2000)। সত্তর দশকের তুলনায় বর্তমান কৃষিতে উন্নততর প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে । কৃষিবিজ্ঞানীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন । মাঠ ফসল ও আঙ্গিনা ফসলের চাষ ও ফলন দুই থেকে তিন গুণ বেড়েছে । সাথে সাথে মানুষও বেড়েছে ব্যাপক হারে । বর্ধিত মানুষের

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাসস্থানের সংকুলান করতে যেয়ে কমেছে কৃষি জমির পরিমাণ। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষি জমির উপর চাপ পড়েছে । একদিকে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমেছে, অন্যদিকে মানুষ বেড়েছে তাই বর্ধিত ফসলের হিসেব সহজে আমাদের চোখে পড়ে না । ফসলের নতুন জাত ও উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশের অধিকাংশ এলাকার কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে । কিন্তু এ হাসি হতে বঞ্চিত হচ্ছে লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষক ও তাদের পরিবার পরিজন । কারণ আজও বৈজ্ঞানিকগণ এ দেশের আবহাওয়া উপযোগী করে লবণ সহিষ্ণু (Salt tolerant) কোন ফসলের উন্নত জাত (variety) উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি । গবেষণা এগিয়ে চলছে, হয়তো একটি লবণ সহিষ্ণু ফসলের নতুন জাতের সৃষ্টি হবে । কিন্তু সেদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে বর্তমান সময়কে সামাল দেয়া লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে লবণ পানির প্রভাব বেশী । সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মোট আয়তন ২৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার । আমাদের দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২০ ভাগ। কোষ্টাল এলাকার মাটিতে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা রয়েছে। লবণের তীব্রতা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলায় এবং বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, নোয়াখালী, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার কিছু অংশে । এ অঞ্চলের কৃষক আদি হতে নিজস্ব কলাকৌশল প্রয়োগ করে কৃষি কাজ করে । সময়ের ধারাবাহিকতায় আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে কৃষক ফসল উৎপাদন করে। ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া গতানুগতিক ও পুরাতন ধাচের হলেও উৎপাদিত ফসল দিয়ে এ অঞ্চলের কৃষকগণ অতীতে স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাত করেছেন। লবণাক্ত অঞ্চলে সত্তর দশকে চিংড়ী চাষ শুরু হয় । এ সময় হতে ধীরে ধীরে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষকের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসে । চিংড়ী চাষের জন্য অপরিহার্য লবণ পানি ফসলের জমিতে প্রবেশ করার ফলে ধীরে ধীরে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় । বিগত দুই দশকে চিংড়ীর আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য ক্রমেই বেড়েছে । তাই কৃষকের ফসলের জমিতে তার স্বেচ্ছায় অথবা কৌশলে এক শ্রেণীর মানুষ চিংড়ী চাষ করে কৃষককে দরিদ্র হতে দরিদ্রতর করেছে । মাঠ ফসলের (Field crop) পাশাপাশি আঙ্গিনার সবুজ বৃক্ষরাজিও লবণ পানির বিরূপ প্রভাবে বিলীন হয়ে গেছে । দক্ষিণ অঞ্চলের নারিকেল, সুপারী, খেজুরের গুড় আস্তে আস্তে কৃষকের চোখের আড়ালে চলে গেছে।

লবণাক্ত অঞ্চলে বর্তমানে ফসলের মাঠ শূন্য থাকে প্রায় সারা বছর । চারিদিকে অঁথে পানি আর পানি । বসতবাড়ীর বৃক্ষরাজীও প্রায় আধামরা, কৃষককুলও নিঃস্ব প্রায় । অতীতে লবণ পানি প্রতিরোধ করে এ অঞ্চলের কৃষক ফসল ফলাতো, তাদের আঙ্গিনা ফসলে ভরে থাকতো । বসতবাড়ীতে ছিল প্রচুর নারিকেল, সুপারী ও ফলের গাছ । সময়ের সাথে সাথে

দুই যুগের মধ্যেই দক্ষিণ বাংলার লবণাক্ত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে গেছে। অনেক কৃষক নিঃস্ব হয়ে জমা-জমি বিক্রি করে শহরে চলে এসেছে । নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষক সংগ্রাম করে বেঁচে আছে । উচ্চবিত্ত ধনী শ্রেণীর কৃষক ফসলের পরিবর্তে চিংড়ী চাষ করে লাভবান হয়েছে । তাই লবণাক্ত অঞ্চলের অতীত ও বর্তমান কৃষির মাঝে অনেক ব্যবধান ।

লবণাক্ত অঞ্চলের অতীত কৃষি

'কৃষি' বলতেই ফসলের কথা মনে হয় । তবে সামগ্রিকভাবে প্রধানতঃ তিনটি ক্ষেত্র হতে কৃষির উৎপাদন হয়ে থাকে। এক: বিভিন্ন ফসল দুই: পশু সম্পদ তিন: মৎস্য সম্পদ । অতীতে দক্ষিণ বাংলার কৃষির ৯০ ভাগই দখল করে ছিল মাঠফসল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আমন ধান । উৎপাদিত ফসল হতে এ অঞ্চলের মানুষের আয় হতো ৭০ ভাগ অর্থ যা বর্তমান সময়ে নেমে এসেছে ৪২ ভাগে (এলাহী, সুবাস এবং সাহিন,১৯৯৮) । লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় আমন ধানের জাতসমূহ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এসব স্থানীয় জাতের মধ্যে অন্যতম ছিল রাজাসাইল, কার্তিক বালাম, চাপসাইল, নোনাকচি, সাদামোটা, লালমোটা, ইন্দোনেশিয়া বালাম, জামাইনাডু, আরমান সরদার ইত্যাদি । বিঘা প্রতি ধানের ফলন ছিল ১৫-২০ মন । সামান্য চাষেই স্থানীয় জাতের ধানের আবাদ করা যেত। এসব স্থানীয় জাতের ধান কিছুটা লবণ সহিষ্ণু ও রোগ প্রতিরোধী । আমন মৌসুমে জুলাই হতে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধানের চারা রোপণ করে ডিসেম্বর হতে জানুয়ারীর মধ্যে কৃষকের ঘরে ফসল উঠত। কৃষকের চাহিদা, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এসব স্থানীয় জাতের ধানের আবাদ হতো । কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে এ অঞ্চলে মানুষের তুলনামূলকভাবে অভাব দেখা দেয় । অতীতে মাত্র ৩ (তিন) মাসের চাষের ব্যবধানে রাজাসাইল ধান কৃষকের আঙ্গিনায় উঠত । একজন কৃষকের ধান প্রতিবেশীদেরও আহার যোগাত । এর কিছু দিন পর কার্তিক বালামধান পেকে যেতো । সব শেষে কাটা হতো লালমোটা বা সাদামোটা ধান । প্রায় ২ মাস ধরে নতুন ধানের ঘ্রাণে কৃষকের আঙ্গিনা ভরে থাকত । অতীতের এসব স্থানীয় জাতের ধানের নাম নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছেই অজানা এবং অপরিচিত । সত্তর দশকের শেষভাগ পর্যন্ত রাজাসাইল বা বালাম জাতীয় ধানের আবাদ হতো প্রায় প্রতি কৃষকের জমিতে । কিছুটা উঁচু জমিতে এ ধান আবাদ হতো । দক্ষিণ অঞ্চলে লবণের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় জাতের ধান আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গেছে । তাই বর্তমানে কৃষকের জমিতে আর ঐ জাতের ধান দেখা যায় না ।

লবণ পানির প্রভাব দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোতে সব সময়ই ছিল কিন্তু এর মাত্রা ছিল কম । অধিকাংশ কৃষিজাতীয় ফসল ৫০০ মি,মো/সেমি মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে

পারে । তবে স্থানীয় জাতের ঐ সব আমন ধান ৫০০ মি,মো/সেমি এর বেশী মাত্রার লবণ সহিষ্ণু ছিল । ফারাক্কা বাঁধের ফলে দক্ষিণ অঞ্চলে পানির লবণাক্ততার মাত্রা অনেক গুণে বেড়ে যায় । চিংড়ী চাষের কারণে অসময়ে লবণ পানি ফসলের জমিতে প্রবেশ করায় ফসলের ফলন আগের তুলনায় ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় ।

অতীতে কৃষক যেভাবে ফসল ফলাতো

ক. মাঠ ফসল (Field crop) ঃ শুস্ক মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর হতে মে পর্যন্ত পানিতে লবণের তীব্রতা বেশী থাকে। অতীতে এ সময় কৃষক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ফসলের জমিতে বাঁধ দিয়ে লবণ পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করত । ফলে জমি শুকিয়ে যেতো । এ সময় মাটিস্থ লবণাক্ত পানি বাস্প হয়ে উড়ে যেতো এবং লবণ মাটির উপরে পড়ে থাকতো । জুন-জুলাই মাসে এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। তাই মাটির উপরে পড়ে থাকা লবণ বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদী ও খালে চলে যেতো। ফলে ফসলের জমিতে একদিকে সমুদ্র বা নদীর লবণাক্ত পানি প্রবেশ করতে পারত না, অন্য দিকে মাটির লবণাক্ততাও বৃষ্টির পানির প্রবাহে অপসারিত হতো ।

জুলাই আগষ্ট মাসে এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় । ফলে লবণ পানি ধীরে ধীরে মিষ্টি পানিতে পারিণত হয় । সে কারণে কৃষকগণ এসময় জমির বাঁধ কেটে দেয়। ফলে জোয়ার ভাটার সাথে মিষ্টি পানি কৃষি জমিতে প্রবেশ করে ও বের হয়। জোয়ারের পানির সাথে প্রচুর পলিমাটি থাকায় ফসলের জমি উর্বর হতো । তাই কৃষকগণ অতীতে জমি আবাদ করে প্রচুর ফসল পেতো ।

খ. বসত বাড়ির ফসল (Homestead crop) ঃ প্রতিটি কৃষকের বাড়ীতে কম বেশী রবিশস্য ও শাক-সব্জী আবাদের একটা নির্ধারিত স্থান ছিল । ঐসব স্থানে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতে প্রচুর সব্জির আবাদ হতো। কৃষকগণ নিজের চাহিদা পূরণ করে উৎপাদিত সব্জি প্রতিবেশীকে দিতো বা বিক্রি করে বাড়তি আয় পেতো ।

গ. উদ্যান জাতীয় ফসল (Horticultural crop) ঃ সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা যেখানে নদী-নালা, খাল-বিলের প্রভাব থাকে ঐসব স্থানে নারিকেল, সুপারী ভাল হয়। এসব ফসল উৎপাদনের জন্য কম তীব্রতার রসাল লবণ মাটি ও ঝিরঝিরে বাতাসের প্রয়োজন হয়। ফসলের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবেশ এ অঞ্চলে ছিল । ফলে অর্থকরী ফসল হিসেবে ব্যাপকভাবে নারিকেল, সুপারীর আবাদ হতো । মাঠ ফসলের পাশাপাশি উদ্যান জাতীয় এসব ফসল হতেও কৃষক বাড়তি আয় পেতো ।

লবণ পানির তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় বসত বাড়ীর ফসল ও উদ্যান জাতীয় ফসলের উৎপাদন অনেকাংশে কমে গেছে। এমনকি কোথাও কোথাও গাছের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এ অঞ্চলের বসত বাড়ীতে এখন শুধু তীব্র লবণ সহিষ্ণু গেওয়া, বাইন, কেওড়া প্রভৃতি গাছ দেখা যায় ।

ঘ. পশু সম্পদ (Livestock) ঃ জমি চাষের জন্য প্রতি বাড়ীতে গরু অথবা মহিষ ছিল। কৃষি কাজের পাশাপাশি দুধ উৎপাদনেও ঐসব গরু ও মহিষ বিশেষ ভূমিকা রাখতো । সারা দেশের গ্রাম বাংলার সাথে এ বিষয়টির অনেক মিল আছে। তবে এ অঞ্চলে লবণ পানির প্রভাবে পশু সম্পদ ব্যাপকভাবে কমে গেছে । বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডেইরী বা পোল্ট্রি খামার গড়ে উঠেনি ।

ঙ. মৎস্য সম্পদ (Fisheries) ঃ অতীতে এ অঞ্চলের নদী-নালা, খাল-বিলে প্রাকৃতিকভাবে ব্যাপক মাছ উৎপন্ন হতো। প্রায় প্রতিটি পরিবারের বসত বাড়ীতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রুই জাতীয় মাছ চাষ হতো । লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বসত বাড়ীতে রুই জাতীয় মাছ চাষ কমে গেছে এবং মিষ্টি পানির মাছ হ্রাস পেয়েছে ।

লবণাক্ত অঞ্চলে কৃষির বর্তমান অবস্থা

ক. মাঠ ফসল (Field crop) ঃ বিগত দুই দশকে ক্রমবর্ধমান হারে চিংড়ী চাষ বেড়েছে । ফারাক্কা বাঁধের ফলে মিষ্টি পানির প্রবাহ কমে গেছে, ফলে সমুদ্রের লবণ পানি জোয়ারের প্লাবনে নতুন এলাকায় প্রবেশ করে লবণাক্ত এলাকা বর্ধিত করেছে। লবণের প্রভাবে মাঠ ফসল উৎপাদন অর্ধেকেরও নিচে নেমে এসেছে । অনেক স্থানীয় জাতের ধান বিলীন হয়ে গেছে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষক চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়েছে, যাদের উপায় নেই তারা পথে বসেছে । পূর্বে এক বিঘা জমিতে ১৫-২০ মন ধান উৎপন্ন হতো । বর্তমানে উৎপন্ন হয় ৪-৫ মন । লবণ অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান খুবই কম উৎপন্ন হয় । তবে যেসব এলাকায় ভেড়ি বাঁধ দিয়ে লবণ পানি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে ঐসব এলাকায় স্থানীয় জাতের ধানের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল (HYV) জাতের ধানের আবাদ হয়ে থাকে ।

খ. উদ্যান ও আঙ্গিনা ফসল ঃ মাঠ ফসলের ন্যায় উদ্যান ও আঙ্গিনা ফসল অনেকাংশে কমে গেছে । নারিকেল, সুপারী বিলীন হয়ে গেছে । বেঁচে থাকা গাছগুলো নির্জীব । গাছের বৃদ্ধি ও ফলন মারাত্মক কম । রবিশস্য উৎপন্ন হয় কম। তবে বর্ষা মৌসুমে কিছু শাক-সব্জি উৎপন্ন হয় । চাহিদার তুলনায় শাক-সব্জির উৎপাদন কম হওয়ায় দেশের অন্য এলাকায় উৎপাদিত শাক-সব্জির উপর জনসাধারণের নির্ভর করতে হয় ।

গ. পশু সম্পদ ঃ চিংড়ী চাষ ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশু সম্পদ । প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বিলের ঘাস খেয়েই গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া বেঁচে থাকত । চিংড়ী চাষের জন্য জমিতে লবণ পানি প্রবেশ করায় মাটি পানিতে ডুবে থাকে, ফলে কোন ঘাস জন্মায় না । খাদ্যের অভাবে পশু সম্পদ আস্তে আস্তে কমে গেছে ।

ঘ. মৎস্য সম্পদ ঃ মিষ্টি পানির মাছ কমে গেছে। সাধারণ মানুষের বসত বাড়ীতে চাষযোগ্য রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন কমেছে । তবে চিংড়ীর (বাগদা) উৎপাদন বর্তমানে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে । চিংড়ী চাষ করতে গিয়ে বিগত একদশকে অন্যান্য মাছের রেণু নিধন হয়েছে বিপুল পরিমাণে। চিংড়ী চাষের প্রথম পর্যায় প্রাকৃতিক চিংড়ীর রেণু/পোনা জোয়ারের পানির সাথে চিংড়ী ঘেরে প্রবেশ করত । সে চিংড়ী পোনা ঘেরে আটকে রেখে বড় করে ঘের মালিকগণ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতেন । এভাবে ৫/৭ বছর চলার পর চিংড়ী পোনা উৎপাদনকারী স্ত্রীজাতীয় চিংড়ীর সংখ্যা সমুদ্রে হ্রাস পেতে থাকে । ফলে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন পোনার সংকট দেখা যায় । এ সময় উন্মুক্ত জলাশয় হতে বিশেষ ধরনের জাল দিয়ে চিংড়ী পোনা আহরণ শুরু হয় । চিংড়ী পোনা আহরণের সময় অন্যান্য মাছের রেণু ধ্বংস হতে থাকে । কেননা এ এলাকার দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ জাল দিয়ে বিভিন্ন মাছের রেণু একত্রে সংগ্রহের পর চিংড়ী রেণু আলাদা করে রেখে অন্যান্য মাছের রেণু নদীর চরে ফেলে দেয় । কারণ অন্যান্য প্রজাতি মাছের রেণুর কোন বাজার মূল্য নেই । ফলে আস্তে আস্তে অন্যান্য প্রজাতির মাছ কমে গেছে । চিংড়ী মাছের রেণু হাজার প্রতি মূল্য ৫০০ হতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত । আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ীর মূল্য বেড়ে যাওয়ায় এ অঞ্চলে চিংড়ী চাষ ক্রমেই বেড়েছে (চিত্র-১)।

চিত্র-১. বিগত দুই দশকের চিংড়ী (বাগদা) চাষ বৃদ্ধির তুলনামূলক হার ঃ

জেলা	সাল ১৯৮৪-৮৫		সাল ১৯৯৭-৯৮	
	চিংড়ীঘের সংখ্যা	ঘেরের আয়তন (হেক্টর)	চিংড়ীঘের সংখ্যা	ঘেরের আয়তন (হেক্টর)
খুলনা	১,০০০	১২,৮২১	৪,০০০	৪০,০০০
বাগেরহাট	৪৫১	১৯,৯৫৫	৪,৯০০	৪৮,৭০০
সাতক্ষীরা	৩৭৭	১৩,২৪০	৫,০০০	৩০,২৩১
পটুয়াখালী	-	-	৪৮	২৫২
নোয়াখালী	-	-	৩০	১৫০
কক্সবাজার	২,৩৯৯	২১,৪৬৮	২,০০০	২৭,৫০০

উৎস্য ঃ Bangladesh at 25 P.335 দৈনিক মুক্ত কণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ৯৯

চিংড়ী চাষ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন । এ অর্থ ধাপে ধাপে সরকার হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত একজন চিংড়ী ঘের মালিক পেয়ে

থাকেন । তবে সমস্যা দরিদ্র প্রান্তিক চাষী ও মধ্যবিত্ত চাষীর । কারণ তারা তাদের স্বল্প পরিমাণ জমিতে চিংড়ী চাষ করতে পারেন না । অর্থের প্রয়োজনে অথবা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের জমি মহাজন ঘের মালিকদের ৩ হতে ৫ বছর মেয়াদে লীজ দিয়ে দেয় । লবণ পানিতে অধিক পরিমাণে চিংড়ী উৎপাদন হয় । তাই ঘের মালিকগণ জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী মাসে চাষযোগ্য জমিতে লবণ পানি প্রবেশ করায় । এতে চিংড়ীর উৎপাদন ভাল হয় । কিন্তু কৃষকের ফসলের জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় । ফলে কৃষক বছর শেষে সামান্য ফসল ঘরে তুলতে পারে । অর্থের প্রয়োজনে তাদের সামান্য ফসলের জমিও একসময় চিংড়ী ঘের মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয় । এভাবে আর্থিক মেরুকরণ চলছে বিগত একদশক থেকে ।

অধিক মাত্রায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণ

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণ অঞ্চল সমুদ্রের লবণ পানির প্রভাবে লবণাক্ত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত । পূর্বে লবণের তীব্রতা কম থাকায় এবং প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে প্রচুর আমন ধানের আবাদ হতো । সারা বছর ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড লবণ পানি প্রতিরোধের জন্য এ অঞ্চলে ওয়াবদা বাঁধ তৈরীর কাজ শুরু করে। সমুদ্রের জোয়ারের লবণ পানির হাত হতে ফসল রক্ষার জন্য বাঁধ দেয়া হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৪,৮০০ কিঃমিঃ লম্বা বাঁধ তৈরী করে ৯,০০০ বর্গকিলোমিটার ফসলের জমি লবণ পানির প্রভাব হতে রক্ষা করে। চিংড়ী চাষ ক্রমেই জনপ্রিয় হওয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঐ প্রকল্প আর বেশী দূর যেতে পারেনি । তাছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের লবণ পানি প্রতিরোধী বাঁধের কারণে অনেক এলাকায় ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে জনসাধারণের নিকট হতে বাধা আসে । বিশেষ করে যশোর, খুলনা জেলার বিল ডাকাতিয়া এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাধের কারণে নদীর তীরে বাঁধের বাইরে পলি জমে উচু হয়ে গেছে । বিল নিচু থাকায় এবং বাঁধের বাইরে পলি জমে উচু হওয়ায় পানি নিষ্কাশনে সমস্যা দেখা দেয় । ফলে ঐ এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় ।

অতীতে পদ্মা নদীর বিশুদ্ধ পানি প্রবাহে এ অঞ্চলের পানি ও মাটিতে লবণের মাত্রা কম ছিল । দক্ষিণ অঞ্চলের তিনটি জেলা বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে পদ্মার শাখা নদী গড়াই ও মধুমতি নদীর বিশুদ্ধ পানির প্রবাহের কারণে লবণের তীব্রতা ফসলের সহনশীল মাত্রায় ছিল । বছরের বিভিন্ন মাসে এ জেলাগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা দেখা যায় (চিত্র-২)।

চিত্র-২. জেলা ভিত্তিক বছরের বিভিন্ন মাসে লবণাক্ততার মাত্রা ।

মাস	জেলা		
	খুলনা লবণের মাত্রা (পিপিএম)	সাতক্ষীরা লবণের মাত্রা (পিপিএম)	বাগেরহাট লবণের মাত্রা (পিপিএম)
জানুয়ারী	১-৫	৫-১৪	১-৪
ফেব্রুয়ারী	৪-৫	৪-১৫	৪-৬
মার্চ	৮-১২	১১-২০	৬-৭
এপ্রিল	১২-১৫	১৪-২৩	৭-১০
মে	১৮-২২	১৬-২৪	১০-১৪
জুন	১২-২০	১০-২০	১০-১৬
জুলাই	২-০	৮-১৪	৬-২
আগষ্ট	০-০	৫-৯	২-০
সেপ্টেম্বর	০-০	৫-৯	২-০
অক্টোবর	০-০	৫-৯	২-০
নভেম্বর	০-০	০-৫	০-০
ডিসেম্বর	০-১	১-৬	০-১

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক রোববার ১২ সেপ্টেম্বর ৯৯

চিত্র-২ হতে দেখা যায় জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত সব জেলাতেই লবণাক্ততা বাড়তে থাকে, এ বৃদ্ধির পার্থক্য ৫ হতে ২০ পিপিএম। জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত লবণের তীব্রতা কম থাকে এর মাত্রা ০ হতে ৮ পিপিএম। তিনটি জেলার মধ্যে তুলনামূলকভাবে সাতক্ষীরায় লবণাক্ততা বেশী (১৬ হতে ২৪ পিপিএম) থাকায় এ জেলায় অধিক পরিমাণ চিংড়ী চাষ হয়ে থাকে। খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় লবণাক্ততা কম থাকায় (১২ হতে ১৬ পিপিএম) ধান ও চিংড়ী উভয় চাষ হয় । বাগেরহাট ও খুলনা জেলার অনেক স্থানে একই জমিতে আমন ধান ও চিংড়ী আবাদ হয় । এক্ষেত্রে ধানের ফলন অত্যন্ত কম হয় । মৌসুমী বৃষ্টিপাত বেশী হলে ধানের ফলন ভাল হয় । কিন্তু চিংড়ী মাছের উৎপাদন কমে যায় । বৃষ্টি কম হলে মাছের উৎপাদন বাড়ে এবং ধানের উৎপাদন কমে যায় । এর অন্যতম প্রধান কারণ বৃষ্টি বেশী হলে মাটি ও পানির লবণাক্ততা কমে যায়, ফলে ধানের ফলন ভাল হয় । অন্যদিকে লবণাক্ততা কমে গেলে চিংড়ীর উৎপাদন কম হয় । কারণ চিংড়ী চাষের জন্য লবণাক্ত পানি অপরিহার্য।

৯৭৫ সালের প্রথম দিকে পদ্মা নদীর উজানে ফারাক্কা বাধ দেয়ার ফলে পদ্মা নদীতে বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ কমে যায়। ফলে শুষ্ক ঋতুতে সমুদ্র হতে প্রায় ২৪১ কিঃমিঃ ভিতরে মাগুরা পর্যন্ত জোয়ারের লবণ পানির প্রবাহ বিস্তৃত হয় । এ সময়

লবণের মাত্রা হয় ২০০০ Micro Mhos (রশিদ, ১৯৯১) । পূর্বে গড়াই নদীতে প্রবাহিত মিষ্টি পানির প্রবাহ/স্রোত 'বড়দিয়া' নামকস্থানে সমুদ্র হতে আগত জোয়ারের লবণ পানির প্রবাহকে বাধা দিত এবং গড়াই নদীর পানির স্রোত নিম্নমুখী হওয়ায় লবণ পানি সমুদ্র হতে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারত না । বরং গড়াই নদীর বিশুদ্ধ পানির স্রোতে শুস্ক মৌসুমে দক্ষিণ অঞ্চলের নদী-নালার লবণ পানি ধীরে ধীরে মিষ্টি পানিতে পরিণত করতো । কিন্তু ফারাক্কা বাধের ফলে পদ্মা নদীতে পানি হ্রাস পাওয়ায় গড়াই নদীর পানির প্রবাহ কমে যায়। ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলিতে সমুদ্রের লবণ পানির তীব্রতা অনেকাংশে বেড়ে যায় । দ্বিতীয়তঃ শুস্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায়ও লবণাক্ততা বেড়ে গেছে । এ লবণাক্ততাই ফসল হানির প্রধান কারণ ।

কৃষি জমিতে লবণাক্ততার প্রভাব

ক. ফসলের উপর প্রভাব ঃ লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মাঠ ফসল হতে শুরু করে আঙ্গিনা ফসল সবক্ষেত্রে ব্যাপক হারে ফলন কমে গেছে । মৃত্তিকা বিজ্ঞানীগণের মতে লবণাক্ত অঞ্চলের মাটিতে প্রাকৃতিকভাবে সোডিয়াম, ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম জাতীয় খাদ্যেপাদান বেশী থাকে । এ অঞ্চলে মাটির PH ৭.৫ হতে ৮.৫ । বর্তমান সময় লবণাক্ততার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বেড়ে যাওয়ায় মাটি হতে গাছ প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান (Essential nutrient elements) সহজে গ্রহণ করতে পারে না । মাটিতে লবণ পানির ঘনত্ব বেশী থাকার কারণে গাছের শিকড় হতে পানি মাটিতে চলে যায় (Deplasmolysis) এবং গাছ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে মারা যায় । লবণাক্ত অঞ্চলে এ কারণে গাছের মৃত্যু হার বেশী । লবণাক্ত মাটিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড বেশী থাকে । এ জাতীয় লবণে ক্লোরিন আয়ন (cl) থাকার কারণে গাছের সবুজ পাতা ক্লোরিনেটেড বা বিবর্ণ হয়ে ফ্যাকাশে সবুজ বর্ণ ধারন করে। গাছের পাতা বিবর্ণ হওয়ার কারণে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) কমে যায় । ফলে গাছ প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে পারেনা। এ কারণে ফসলের ফলন কম হয়। চিংড়ী চাষের জন্য মাটির PH ও লবণাক্ততা বেশী হলে ভাল হয় । তাই চিংড়ী খামার মালিকগণ কৃত্রিমভাবে এ অঞ্চলের মাটিতে চুন ও লবণ প্রয়োগ করেন । এর প্রভাবে মাটির PH ৮ হতে ৯ পর্যন্ত বর্ধিত হয় । ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির PH ৬.৫ হতে ৭.০ উত্তম । অধিক মাত্রার PH ও লবণাক্ততা ফসল হানির অন্যতম প্রধান কারণ ।

খ. পরিবেশ বিপর্যয় ঃ লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে ফসলের সাথে সাথে এ অঞ্চলে বৃক্ষরাজী ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রতি

বছরে দেখা যায় । বিশেষ করে এপ্রিল-মে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশী দেখা যায় ।

গ. সামাজিক সমস্যা ঃ কৃষি জমির উৎপাদন কমে যাওয়ায় এবং চিংড়ী উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষকগণ প্রতিনিয়ত তাদের জমি বিক্রি করে দেয় ধনী চিংড়ীঘের মালিকদের কাছে । চিংড়ীঘের মালিক মানেই বেশী জমির মালিক একথা সবক্ষেত্রে সত্য নয় । কারণ বাহুবলে ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমেও অনেকে রাতারাতি ঘের মালিক হয়েছেন । এসব ঘের মালিকগণ নিঃস্ব অবস্থা হতে অর্থনৈতিকভাবে সমাজের উচুস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন । সমাজে ভদ্র হিসেবে স্বীকৃত দুর্বল মহাজনগণ তাদের জমির নিরাপত্তা বিধান করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রভাবশালীদের কাছে জমি লীজ দিতে বাধ্য হয় । আবার অনেক ক্ষুদ্র চাষী অর্থের প্রয়োজনে অথবা তার স্বল্প জমিতে চিংড়ী চাষ করার সুযোগ না থাকায় ৩ হতে ৫ বছর মেয়াদে চিংড়ীঘের মালিকদের কাছে কৃষি জমি লীজ দিয়ে দেয় । ফলে এ অঞ্চলে সামাজিক কাঠামোর অনেক পরিবর্তন হয়েছে । নিরীহ মানুষ অনেকে গ্রাম ছেড়েছে ।

গরু মহিষ ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় কৃষি জমি চাষাবাদে সমস্যা দেখা দেয় । তাই অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার জমি বর্গা দিয়ে দেয় । ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষকের অসুবিধা হলেও সমাজের উচু শ্রেণীর মানুষ ভাল আছে। তবে তার সংখ্যা হাতে গোনা । দিনমজুরদের ভাগ্য কিছুটা পরিবর্তন হয় চিংড়ী মৌসুমে । এ সময় তারা দৈনিক ১০০-১৫০ টাকা পারিশ্রমিক পায় ।

কৃষি সমস্যা সমাধানের উপায়

প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে কৃষিজ উৎপাদন প্রধানতঃ ফসল, পশু সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ হতে আসে । এককভাবে এর কোন একটা দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয় । তাই ফসল ও পশু সম্পদ ধ্বংস করে শুধু চিংড়ী উৎপাদন বাড়ালে প্রকৃত উন্নয়ন হবে না । এ অঞ্চলের কৃষকের কিছু না কিছু কৃষি জমি আছে, তাই ভাল ফসল হলে কম বেশী সব পরিবারের উপকার হয় । কিন্তু ফসল ধ্বংস করে শুধু চিংড়ী উৎপাদন করলে সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের উপকার হয়। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে । জাতীয় পরিকল্পনায় এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া গেলে এলাকার মানুষের ভাগ্য বদলাতে পারে । সাথে সাথে দেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে । নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো এ সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে-

ক. ফসলী জমি ও চিংড়ী আবাদের জমি সনাক্ত করে আলাদা করা ঃ সব জমিতে ভাল ফসল হয় না, আবার সব জমিতে ভাল চিংড়ী উৎপন্ন হয় না। যে জমি যে কাজে লাগে সে জমিতে সে জাতীয় ফসল অর্থাৎ চিংড়ী অথবা ধান উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া যায়। তবে, যে জমিতে ধান ও চিংড়ী উভয় উৎপন্ন হয় সে জমিতে ধানের উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষকের সুবিধার্থে নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এর ফলে ফসলের জমিতে চিংড়ী ঘের মালিকগণ অসময়ে লবণ পানি উঠাতে পারবেন না। কৃষকের সুবিধার্থে ফসল আবাদের সময় জমি হতে ঘের মালিকগণ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিলে জমি চাষে কোনে সমস্যা হবে না। ফলে কৃষক জমি চাষ করে ফসল ঘরে তুলতে পারবেন।

খ. ভেড়িবাঁধ ঃ কিছু কিছু এলাকায় ভেড়িবাঁধ দিয়ে লবণ পানি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এর ফলে ২/৩ বছরের মধ্যে জমির উর্বরতা ফিরে আসবে এবং একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। ভেড়িবাঁধের ভিতর আঙ্গিনা ও উদ্যান জাতীয় ফসলের উৎপাদন আগের মত বেড়ে যাবে। ইতোমধ্যে কিছু এলাকায় ভেড়িবাঁধ দেয়ায় ভাল ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার 'ফয়লা' নামক গ্রামটি ভেড়িবাঁধের আওতায় আনা হয়েছে ৩/৪ বছর পূর্বে। ইতোমধ্যে ঐ এলাকায় একাধিক ফসল আবাদ শুরু হয়েছে। সাথে সাথে নীচু এলাকায় ও পুকুরে স্বাদুপানির মাছ ও 'গলদা' চিংড়ী আবাদে ভাল ফল পাওয়া গেছে। একই উপজেলার অন্য এলাকায় ভেড়িবাঁধ্ না থাকায় শুধু লবণ পানিতে চাষযোগ্য 'বাগদা' চিংড়ী আবাদ হয়। লবণের প্রভাবে এখানে ভাল ফসল উৎপন্ন হয় না।

গ. কৃষি গবেষণার মাধ্যমে লবণ সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের উন্নতজাত উদ্ভাবন করে এবং লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ফসলের বীজ সংরক্ষণ করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

ঘ. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় করে এলাকার পরিবেশ ও জনসাধারণের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব প্রকল্পে স্থানীয় প্রযুক্তি ও জনসাধারণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান হতে পারে। সর্বোপরি সরকারিভাবে বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

ঙ. চিংড়ী চাষের নীতিমালা প্রণয়ন করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

উপসংহার

আমাদের দেশের মোট আয়তনের এক পঞ্চমাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সমুদ্র তীরবর্তী (coastal area) এলাকা। এ এলাকায় অর্ধেকেরও বেশী কৃষি জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় ক্ষতিগ্রস্ত। মৌসুমী বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলের কৃষি ফসল

উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান । প্রকৃতি নির্ভর বৃষ্টিপাতের প্রভাবে এলাকার কৃষক নিজস্ব কলাকৌশল প্রয়োগ করে যুগ যুগ ধরে ফসল উৎপাদন করে এসেছে । সত্তর দশকের মাঝামাঝি ফারাক্কা বাঁধের কারণে স্বাদু পানির প্রবাহ কমে যায় । ফলে সমুদ্রের লবণ পানি নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত করে এবং কৃষি জমি লবণাক্ত হয়। আশির দশকে ব্যাপক হারে বাগদা চিংড়ীর আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় লবণ পানির প্রভাবে কৃষি জমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা কমে যায় । লবণাক্ততা এ অঞ্চলের কৃষি কাজের জন্য একটা প্রাকৃতিক দূর্যোগ । সত্তর দশকের তুলনায় বর্তমান সময় লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষি ফসলের উৎপাদন ৬০-৭০ ভাগ কমে গেছে । নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষক ও প্রান্তিক চাষী কৃষি জমি বিক্রি করে এলাকা ছেড়েছে অথবা জীবিকার সন্ধানে পথে বের হয়েছেন । উচ্চবিত্ত মহাজন চিংড়ী চাষ করে লাভবান হয়েছেন । সন্ত্রাস ও ক্ষমতার দাপটে এক শ্রেণীর মানুষ এলাকার নিরীহ কৃষকের নিকট হতে কৌশলে বা জোরপূর্বক জমি লীজ নিয়ে রাতারাতি সমাজের উচু স্তরে নিজের স্থান করে নিয়েছে । জমির প্রকৃত মালিক কৃষকের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে । একই সাথে লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষিতেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে । বিভিন্ন ফসলের স্থানীয় জাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে । কৃষি জমির স্থান দখল করে নিয়েছে চিংড়ী ঘের। ১৯৮০ সালে চিংড়ী চাষের জমি ছিল ২০,০০০ হেক্টর । ১৯৯০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৫,০৮৮ হেক্টরে পরিণত হয়েছে, বৃদ্ধির হার ৪৭৫% । বর্ধিত হারে চিংড়ী চাষ বর্তমানে ব্যাপক পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । চিংড়ী চাষের ফলে ফসলের জমির পরিমাণ কমেছে, ফসল উৎপাদন কমেছে, লবণাক্ততা বেড়েছে, মানুষের পেশার পরিবর্তন হয়েছে, সর্বোপরি ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ।

আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ীর মূল্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে চিংড়ীর আন্তর্জাতিক মূল্য ব্যাপক হারে কমে গেছে । বর্তমানে চিংড়ী খামারগুলো মারাত্মকভাবে ভাইরাস রোগে আক্রান্ত । সুতরাং লবণাক্ত এলাকার সব শ্রেণীর মানুষ কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত । তাই এলাকার মানুষ আজ লবণাক্ত অঞ্চলের অতীত কৃষি নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করছেন । সঠিক পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা আবার লবণাক্ত অঞ্চলের কৃষকের মুখে হাসি ফুটাতে পারে ।

তথ্যসূত্র

১. Ali, A, F. Islam and R, Kuddus, Development Issues of Bangladesh. pp, 384-385

২. Elahi, K.M, S.C. Das, S. Sultana. Geography of Coastal Environment: A study of selected Issues. pp 335-365

৩. Hossain, M.A. Life pattren and economic activities of coastal people in Bangladesh: Research Report, BPATC.

৪. Statistical pocket book, 2000, Bangladesh Bureau of Statistics,P- 274

৫. বিষ্ণু দাস, চিংড়ী চাষ ও ব্যবস্থাপনা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃঃ ৭

৬. সাপ্তাহিক সুন্দরবন ৯ অক্টোবর ১৯৮৯

৭. সাপ্তাহিক রোববার ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

৮. দৈনিক জনতা ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

৯. দৈনিক মুক্তকণ্ঠ ১৬ অক্টোবর ১৯৯৯

১০. দৈনিক মানব জমিন ১৬মে ২০০১

১১. দৈনিক মানব জমিন ১৫মে ২০০২